বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

উজান স্রোতে জীবনের ভেলা

অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ

(৪০)

লেখাপড়া করে যে, জুতো ক্ষয় করে সে

প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিক শামসুর রাহমান সাহেব সম্প্রতি দৈনিক 'সংবাদ'-এ এক মনোজ্ঞ উপ-সম্পাদকীয় লিখেছেন। এর শিরোনাম হল 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'। তিনি অতীতের এই জনপ্রিয় প্রবাদটি বর্তমানে কীভাবে বরবাদ, অকেজো হয়ে পড়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবাদে যুগসত্যেরই প্রতিফলন ঘটে। সে-যুগ চলে গেলে সে প্রবাদের কার্যকারিতাও বাতিল হয়ে যায়। যেমন, পুরনো যুগের প্রবাদ হল, আদার বেপারীর জাহাজের খবরে কি লাভ। কিন্তু আজকের যুগে আদার বেপারী কবে জাহাজ বন্দরে ভিড়বে সে খবর না রাখলে ব্যবসায় লালবাতি জ্বলার সম্ভাবনা ষোল আনা।

যে যুগে 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে' এ প্রবাদের প্রচলন হয় সে যুগ ছিল ঘোড়ার গাড়ির যুগ। ষাট-সত্তর বছর আগে চট্টগ্রাম শহরে মাত্র চার-পাঁচটি মোটর গাড়ি ছিল। তাও ছিল শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দখলে। শহরে বসবাসকারী এদেশীয় অভিজাত এবং ধনী ব্যবসায়ীরা নিজস্ব এক ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতেন। একে রাগ্গী বলা হত। সাধারণ নাগরিকদের চলাচলের জন্য ঘোড়ার গাড়ি ভাড়ায় পাওয়া যেত। সে গাড়ি দুই ঘোড়ায় টানত। তখন চালের মণ ছিল দু'টাকা। কাজেই ভাড়াও ছিল খুব কম। ঢাকায় পালকি গাড়ির প্রচলন ছিল। এ ধরনের ঘোড়ার গাড়িতে চারজন বসতে পারত। রমনা থেকে সদরঘাট যেতে ভাড়া লাগত মাথাপিছু দু'আনা হিসেবে আট আনা। ঢাকার কুট্টি গাড়োয়ানরা খুব রসিক ছিল। কেউ যদি বলত আট আনা কেন, ছ' আনায় চল, তখন গাড়োয়ান বলত ছাব, আর কইয়েন না, ঘোড়ায় হাছব। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এ দেশে সাইকেল রিকশার প্রচলন হয়। সাইকেল রিকশার বেলের শব্দে ঘোড়া ভয় পেয়ে রাস্তা থেকে দৌড়ে পালায়। আধুনিক অর্থাৎ যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবস্থা এই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে। যন্ত্রের শব্দে মন্থরযুগের যানবাহন রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন যারা ভাড়ায় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ত এখন তারা বাসে কিম্বা রিকশায় চড়ে।

'গাড়িঘোড়ায় চড়া' মানে ভদ্র শ্রেণীভুক্ত হওয়া, কায়িকশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা আরাম-আয়াসের সুযোগ লাভ করা। যে যুগে এ প্রবাদ রচিত হয় সে যুগে লেখাপড়া না শিখলে জমিতে কাজ করা ছাড়া জীবিকা অর্জনের অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। কাজেই লেখাপড়া শেখার অর্থ হল কৃষক শ্রেণী ...বিত্ত অন্ততঃ নিম্ন মধ্য... তে উন্নীত হ...

বলে আখ্যায়িত, 'ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা আমার শিক্ষক প্রয়াত অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র সিংহ আমার স্বগ্রামবাসী ছিলেন। আমি যখন মাইনর স্কুলে পড়ি তখন আমার অভিভাবক আমাকে খুব কড়া সুরে বলতেন, মন দিয়ে লেখাপড়া করে যোগেশ বাবুর মত হও। না হয় গরু চরাও গে। ঠিক কথা, আমাকে চরানোর জন্য অভিভাবক আমাকে গুরুদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন আমি যদি গুরুর তত্ত্বাবধানে ঠিকমত না চরি-অর্থাৎ গোগ্রাসে বিদ্যার্জন না করি তাহলে গরু চরান ছাড়া আমার কপালে আর কি থাকতে পারে। একথা যখন ভাবি তখন আমার মনে পড়ে যায় রামসুন্দরের বাল্যশিক্ষার কথা: 'মা ও ছেলে। মা, ঐ বাড়িটি কার? বাড়ির চারিদিকে কী সুন্দর ফুলের বাগান। এমন সুন্দর ফুল আর কখনও দেখি নাই। সুরেশ, তুমি জান না এই বাড়িটি জগদীশ বাবুর। তাঁহার পিতা বড় দুঃখী ছিলেন। (যোগেশ বাবুর বাড়িও সেরকম ছিল। যোগেশ বাবুর বাবাও বড় দুঃখী ছিলেন।) জগদীশের বয়স যখন সাত বছর তখন তার বাপ মারা যান; জগদীশ বড়ই দুঃখে পড়ে। (আমার যখন বয়স সাত বছর-তখন আমার বাপ মারা যান। আমিও বড় দুঃখে পড়েছিলাম।) কিন্তু তখনহইতে জগদীশ মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে। লেখাপড়ার গুণেই জগদীশ বড় লোক হইয়াছে। এখন জগদীশ গাড়িঘোড়ায় চড়িতেছে।' (রামসুন্দর বসাকের আদি বাল্যশিক্ষা হতে এই উদ্ধৃতি। জনশ্রুতি এই বাল্যশিক্ষা বিদ্যাসাগরেরই লেখা। তিনি দরিদ্র রামসুন্দরকে পাণ্ডুলিপিটি দান করেছিলেন। এই বাল্যশিক্ষার বদৌলতে বসাকগোষ্ঠী নাকি আজ কোটিপতি।)

আমি পড়াশোনায় মনোযোগী ছিলাম। কিন্তু আমাকে যোগেশ বাবু বানাতে গিয়ে আমার অভিভাবক যোগেশ বাবুর বাবার কাছে ছ'শ' টাকায় চার কানি জমি বিক্রি করেন, যার বর্তমান মূল্য দেড় লাখ টাকা। অভিভাবকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। এম,এ পাস করে চট্টগ্রাম কলেজে ইংরেজী বিভাগে যোগেশ বাবুর সহকর্মী হয়ে গেলাম। এই শ্রেণীগত রূপান্তর এক রোমাঞ্চকর sensation বা ভাবাবেগের সৃষ্টি করে—'sensation felt along the blood, felt along the heart' আত্মীয়বান্ধবদের মধ্যেও এ ঘটনা চাঞ্চল্য ও গৌরববোধের সঞ্চার করে; কোট-প্যান্ট-নেকটাই—মহারাজা সু পরিহিত হয়ে গাড়িঘোড়ায় চড়া শুরু হয়ে গেল!

পাঁচ দশক আগে ... না নয়। উপার্জি... ত হই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জনশিক্ষার প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমাদের দেশীয় শাসকগোষ্ঠীরও শিক্ষার প্রতি সে একই দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গত ৪০ বছরে দু'বার স্বাধীন হবার পরও এই শাসকগোষ্ঠির শাসনামলেও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার শতকরা বিশজনে রয়ে গেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মত তারাও ব্যাপক জনগণকে শিক্ষা প্রদান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে। বর্তমানে শিক্ষার হার হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিক্ষার হারের ওপরে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও ইতিহাসের গতিধারায় পঙ্গু বুর্জোয়া বিকাশের কারণে স্কুল-কলেজের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। কিন্তু সরকারের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা না থাকায় দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ আকারে বেড়ে গেছে। এই শিক্ষিত বেকারেরা এক দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। 'দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় বিশ লাখ। বেকার আছেন কিছু ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারও। সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেছেন, আমাদের দেশে বর্তমানে দেড় কোটির মত যুবকের কোন কর্মসংস্থান নেই। আগামী দু'হাজার সালে সমাজের কাছে জীবিকার নিশ্চয়তা চাইবে এমন যুবকের সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে যাবে।' (বিচিত্রা ২৯-৪-৮৮) অপরদিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় দফতরে সোয়া লাখ শূন্যপদ রয়েছে যাতে নিয়োগের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু 'শিক্ষাবার্তা'-এর মতে (পৌষ-মাঘ ১৩৯৪) দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৪৫ লাখ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কার্যতঃ বেকার উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়েছে। ঢাকার একটি দৈনিকের মতে শিক্ষিত, নিরক্ষর বেকার এবং আধা বেকার মিলে দেশে বেকারের সংখ্যা আড়াই কোটির মত।

দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার কিছু নজির দিই। ১৯৮৭ সালে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ছয়শ' করণিক পদের জন্য সোয়া লাখ দরখাস্ত পড়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭৭৮টি পদের জন্য প্রায় ৫৫ হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৯৮৭'র জানুয়ারীতে মোট এক হাজার তিনটি পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। যোগ্যতার কড়াকড়ি সত্ত্বেও এসব পদের জন্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় বত্রিশ হাজার তিন শ' জন। লেখাপড়া শেষ করে এই বিপুলসংখ্যক বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের খোঁজে এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে শুধু জুতোই ক্ষয় করছে। কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। কৃষক পরিবার থেকে আগত একজন যুবক পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশনে বি, এ, অনার্স এবং এম, এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে তিন বছর ধরে আমার কাছে আসা-যাওয়া করেছে। অনেক চেষ্টা-তদবির করেও তার একটা ছোটখাট চাকরিও হয়নি। তার শুধু জুতোই ক্ষয় হয়েছে। এখন সে আর আমার কাছে আসে না। তার বাবা তার ছোট ভাইদের পড়াশোনার প্রতি উদাসীন হয়ে

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। মনে করি যে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখালে সে কায়িক কষ্ট এবং সামাজিক অমর্যাদা থেকে রেহাই পাবে।

১৯৫০-সাল। তখন আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষক। এক সকালে কলেজের অধ্যক্ষ প্রাক্তন আই, সি, এস জনাব আবতাব হামিদ খানের সাথে প্রাতঃভ্রমণ করছিলাম। কিছু কৃষক গ্রামাঞ্চল থেকে চাল, তরিতরকারি ইত্যাদি কাঁধে বয়ে রাজগঞ্জ বাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। বললাম, দেখুন স্যার, কী কষ্ট করে লোকে কাঁধে করে এ সব জিনিস বয়ে আনছে। তিনি আমাকে বললেন, পিরোজপুরে এস, ডি-ও থাকাকালে আমি একদিন বাজারে গেলাম। এক চাল বেপারীকে বললাম, তোমার চালের ভারটা আমার কাঁধের ওপর তুলে দাও। কাঁধে নিয়ে সাত-আট কদম যেতে না যেতে কাঁধে এমন টনটনে ব্যথা শুরু হল যে আমি তাড়াতাড়ি কাঁধে থেকে ভারটি নামিয়ে ফেলি। (এ প্রসংগে বলা দরকার, অধ্যক্ষ খান প্রথম জীবনে খাকছার ছিলেন। পরে গান্ধী এবং টলষ্টয় তাঁর চিন্তাধারাকে খুবই প্রভাবিত করে। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবই তার ওপর সমধিক। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন।) মূল কথা হল, লেখাপড়ার উদ্দেশ্য ছিল (এদেশে এখনো তাই) ভদ্রলোক হওয়া (মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হওয়া) যাকে ইংরেজ লেখক William Hazlitt বলেছেন getting into good society মধ্যবিত্ত হবার তাগিদেই ঘরে তেল ফুরিয়ে গেলে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কলকাতার রাস্তায় ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে পর দিনের স্কুলের পাঠ নিতেন।

নিঃসন্দেহে সে যুগে লেখাপড়া শিখতে পারলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটান যেত এবং কৃষক শ্রেণী থেকে এক লাফে মধ্যবিত্ত হওয়া যেত। আমরা উপনিবেশ থেকে নয়া ঔপনিবেশিক স্তরে পৌঁছেছি। ইতিমধ্যে আমরা দু'বার স্বাধীনও হয়েছি। কিন্তু '৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গত ৪০/৪২ বছরে শাসকগোষ্ঠি শতকরা ৪০ জন মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করেনি। গত ৪০ বছরে স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে যে পরিমাণ রক্ত আমরা ঢেলেছি সে পরিমাণ কালি জনগণের শিক্ষার জন্য তারা খরচ করেনি। এখনো গ্রামাঞ্চলে অনেক নিরক্ষর মানুষ কুড়ির ওপরে গুণতে জানে না। তারা এক কুড়ি, দু'কুড়ি, তিন কুড়ি করে মহার... এর দাম ছিল তিন টাকা। এ... এক জোড়া জুতোর হাফসোল করতে লাগে পনের টাকা। প্রতিদিন চাকরির সন্ধানের কাজে লাখ লাখ যুবকের জুতোর তলা ক্ষয় হওয়াটা জাতীয় সম্পদের অপচয় এবং সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ।

আমার গ্রামের এক কৃষক সেদিন আমার কাছে তার ছেলের একটা চাকরির ব্যাপারে দেখা করতে এসেছিল। তাকে চাকরি যোগাড়ের ব্যাপারে সবিনয়ে আমার অক্ষমতা জানালে সে কপালে হাত দিয়ে আক্ষেপ করে বলল: আমি চাষাভুষা মানুষ। আমাকে কোন ভূতে পেয়ে ছিল যে আমি পড়াশোনায় ভাল বলে ছেলেকে কলেজে পাঠিয়েছিলাম। সবাই বলেছিল ছেলেটা পড়াশোনায় ভাল, তাকে কষ্ট করে হলেও কলেজে ভর্তি করে দাও। তোমার পরিবারের উন্নতি হবে। এখন বছরের পর বছর বেকার হয়ে সে আমার ঘাড়ে চেপে আছে। তার ছোট ভাইদের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারছি না। ছেলেটি চাকরিও পায় না, চাষের কাজের যোগ্যতাও হারিয়েছে। সে লেখাপড়া শিখেছে। ভদ্রলোকের মত জীবনযাপন করতে চায়। জমিতে নামতে চায় না। জোঁক দেখলে ভয়ে লাফ মেরে আলের ওপর উঠে দাঁড়ায়। এমন মন্দ কপাল হবে বলে জানলে আমি তাকে কখনো স্কুলেও পাঠাতাম না।

কাজেই যুগের পরিবর্তনে লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে—এ প্রবাদের আর কোন পোটেন্সি নেই। শামসুর রাহমান সাহেবও বলেছেন: 'এমনও দেখা যাচ্ছে যে ম্যাট্রিকও পাস করেনি সে দিব্যি দামী মোটরকার হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে (খুব সম্ভব দু'নম্বর কারবারের বদৌলতে—লেখক)। আর যিনি মোটা মোটা বই পড়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি মোটর কারের মালিকের গাড়ির ধুলো খাচ্ছেন কিংবা গাড়িচাপা পড়ছেন'। আমি রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করি। আমি চাই যে গরীব লোক বলে গাড়ি কেনার সৌভাগ্য না হলেও হঠাৎ বড় হওয়া কোন বড় লোকের গাড়ি চাপা পড়ার দুর্ভাগ্য আমার না হোক। অবশ্য টাকার জোরে বাঘের চোখও পাওয়া যায়। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বি এ, এম, এ-র সার্টিফিকেট জাল হচ্ছে। জাল সার্টিফিকেট তৈরীর যন্ত্রপাতিসহ লোক ধরা পড়েছে। পত্রিকায় তার ছবি বেরিয়েছে। কাজেই টাকার জোরে যে গাড়ি করেছে তার এম, এ ডিগ্রীধারী হতেও কোন অসুবিধে নেই। এই সমাজব্যবস্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সরস্বতীকে লক্ষ্মীর পদানত করে।

দেশের এই ভয়াবহ সংকট নিয়ে বিলাপ করে লাভ নেই। শিক্ষা সমস্যা ও বেকার সমস্যা বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অর্থাৎ অব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী ফল। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েই সমস্যাসমূহের সমাধান করতে হবে। বর্তমান শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা পাল্টে সমগ্র জনগণের কর্মসংস্থান, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বার্ধক্য ভাতার নিশ্চয়তা বিধানকারী নয়া এক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

15 MAR 1989
৫ কলাম ৩

...শ্রেণী ভুলের পুনরাবৃত্তি করে ভারতবর্ষকেও হারানো চলবে না। এই বিরোধিতার ফলে উইলবার ফোর্সকে তার প্রস্তাব তুলে নিতে হয়। (শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, পৃ: ২৩) এর শতাধিক বছর পরও ভারত সরকারের সুপরিচিত বৃটিশ অফিসার হার্টগ গণশিক্ষার বিরোধিতা করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রয়োজনে পথঘাট নির্মাণ, রেললাইন প্রবর্তন প্রভৃতির কারণে ১৮৫৪ সালের দিকে বৃটিশ শাসকের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন ঘটে। বেতন নিয়ে পরিচালিত স্কুলে তারা গ্রান্ট-ইন-এইড দেবার সিদ্ধান্ত নিল। ১৮৬১-৭২ সালে বাংলাদেশ ছাড়া সমস্ত প্রদেশে শিক্ষা কর বসান হল।

১৯২০ সালে বাংলা গভর্নমেন্ট মিঃ বিসকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের একটি কর্মসূচী সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বিপক্ষে শক্তিশালী বিরোধিতার কথা বিলস তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। বিরোধীকারীদের যুক্তি ছিল: চাষীর ছেলের রোদ বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা চলে যাবে। ঐ ছেলে পিতার কাজকে ঘৃণা করতে শিখবে। চাকর-বাকর নষ্ট হয়ে যাবে। চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশি করে উপলব্ধি করবে এবং তা দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম শুরু করবে। বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট প্রাচ্যের জনসমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপদের উল্লেখ করে। যদি চাষী পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে আরম্ভ করে তাহলে নীতিহীন প্রচারকের পাল্লায় পড়বে। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ প্রলেটারিয়েটকে যুক্ত করা বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতা। প্রাইমারী শিক্ষার বিরোধিতাকারীরা মনে করতো, যে কৃষক পড়তে জানে তাকে ঠকানো খুব কঠিন। জমিদাররা কৃষকের অজ্ঞতার সুযোগে তাদের হাজারো রকমে ঠকাতো এবং প্রজা লেখাপড়া শিখলে মোটা অংকের বেআইনী আদায় জমিদার ও তার কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব হবে না। ... একশ্রেণীর হিন্দু—জমিদার প্রাইমারী শিক্ষার বিরোধিতায় আর সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিলের বিরোধিতা করতে গিয়ে সনাতনধর্মী জমিদার শিব শেখরেশ্বর বলেন, "ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য যারা শতকরা শতজনই শিক্ষিত এই আইনে তারা কিছু উপকৃত হবেন না। মুসলমান, নমশূদ্র এবং অন্যান্য নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাই উপকৃত হবে।" এধরনের বিরোধিতা সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়িয়ে তোলে। তবু বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন বিল পাস হয়।

ভারতবর্ষে বুর্জোয়ারা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কথা ভেবে ছিলেন। তাদের অভিমত ছিল, কিছু লেখাপড়া জানলে শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য ভারতের গঠনতন্ত্রে প্রাথমিক শিক্ষার কথা রয়েছে। (দ্রষ্টব্য: শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক, ... শাহেদুল্লা, পৃ: ২১-২৯)। ...র দীর্ঘ ইতিহাস ...। ১৯৪৭